মাতৃস্মরন

আমাদের শ্রীশ্রীমা

স্বামী গৌতমানন্দ
পরমপূজনীয় সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ,
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

আদিবাসী-উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসবে স্কুলপড়ুয়াদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নানা জিনিস, যেমন ছোট পুস্তিকা, শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবিযুক্ত লকেট ইত্যাদি রাখা হয়। আদিবাসী বালক-বালিকারা সবসময়ই কেবল শ্রীশ্রীমায়ের লকেটই কিনতে চায়। এই শিশুদের মধ্যেও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণ—এটি একটি আশ্চর্য ঘটনা বলতে হবে।

সাধারণত ভারতে এবং ভারতের বাইরেও সারদা দেবীর প্রতি জনমানসে একটা তীব্র আকর্ষণ লক্ষ করা যায়। শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে এমন কী আছে, যা এই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু?

আমাদের আপন গর্ভধারিণী জননীকেই বা আমরা এত ভালবাসি কেন? যখনই কোনও সমস্যায় পড়ি, আমরা মাকে ডাকি। শিশু তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রতি একটা বিজাতীয় ভয় অনুভব করে। সে চায়, কেউ তাকে রক্ষা করুক, আর এইটি সে পায় তার মায়ের কাছে, মা-ই তার রক্ষাকর্ত্রী। শিশু বুঝতে পারে, মা যখন তার আশেপাশে থাকে, কেউ তার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই সে আপন জননীকে এই সুরক্ষাদায়ী শক্তি হিসেবে দেখে। এই ভাবই শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চেতনার গভীরে প্রবেশ করে। একইভাবে, মা-ই সেই আশ্রয় যেখানে সন্তান সেবা ও করুণা লাভ করে এবং মা স্বয়ং এই দুই ভাবের উৎসস্বরূপা। শিশু অসুস্থ হলে রুগ্ন ও অসহায় অবস্থায় সর্বদা মায়ের কাছ থেকে মমতা ও পরিচর্যা পায়। আর একটি হল মায়ের

উৎসাহবাক্য, যা শিশুকে চলতে শেখায়, নিজেকে বিকশিত করে তুলতে শেখায়। মায়ের এই সুরক্ষা, সহানুভূতি, সেবা এবং উৎসাহ দান এতই গভীর ও ঐকান্তিক যে, মাকে দেখামাত্রই আমাদের হৃদয়ের ভালবাসা যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঝরে পড়তে থাকে। এক জননী তাঁর সন্তানের জন্য সর্বদা ও সর্বথা এই প্রার্থনাই করেন—"আমার সন্তান যেন সকলের সেরা হয়ে ওঠে!"

যদি হৃদয়ে ভালবাসা থাকে, স্বভাবতই আমাদের ভালবাসার পাত্রকে বা ভালবাসার স্থানকে রক্ষা করতে আমরা প্রয়াসী হই। তখনই আমরা তার সুরক্ষাদায়ী শক্তি হয়ে উঠি, তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠি, তার সেবা করি, তাকে উৎসাহ দিই। মায়ের মধ্যে এই প্রেম সীমাহীন, অগাধ। শুধুমাত্র প্রেম হৃদয়ে বিরাজ করে বলেই মাতৃহৃদয় থেকে অন্য সকল গুণ নিঃসৃত হয়ে মাতৃত্বের প্রকাশ ঘটায়।

এই প্রেম আসে একত্বের বোধ থেকে। মা সন্তানকে দৈহিকভাবে নিজের সঙ্গে অভিন্ন বোধ করেন। শিশুর জন্মের পর প্রথম দুটি বছর আমরা মাকে তাঁর শিশুসন্তানকে ছেড়ে থাকতে দেখি না, শিশুটি যেন মায়ের প্রাণ। কিন্তু ওই একই মা নিজের সন্তান ছাড়া অন্যের সন্তানের প্রতি অনুরূপ ভাব বোধ করেন না। এই একত্বের বোধ স্থূল, কেবল দৈহিক স্তরে সীমাবদ্ধ। সেজন্যই পরবর্তী কালে এই সীমাবদ্ধ ভালবাসা দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে। সন্তান ও মা, উভয়ের পক্ষেই সেটি একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সন্তান যখন নিজের ভাবে বিকশিত হতে চায়, মা তাতে বাধা দেন।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে আমরা ঠিক এর বিপরীতই দেখতে পাই। তাঁর স্নেহ-ভালবাসার উৎসটি আধ্যাত্মিক। শ্রীশ্রীমা নিজের দৈবীসত্তা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তিনি যে স্বয়ং কালী, সীতা, রাধা বা লক্ষ্মীরূপিণী পরাশক্তি, সেটি বোধে বোধ করতেন। এই মাতৃত্ব বিশ্বজনীন—সমগ্র মানবজাতি তো বটেই, দেবদেবী থেকে আরম্ভ করে কীট-পতঙ্গ-জীবজন্তু সহ সকল প্রাণী এই সর্বগ্রাসী মাতৃত্বের আওতায়। শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে প্রকাশিত দয়া, সেবা, প্রেরণা, সুরক্ষা ইত্যাদি সকল ভাবের উৎসও এই দিব্য একত্বানুভূতি। এই হলেন মা, যিনি ছিলেন দেবী-মানবী এবং তাঁর মাতৃত্বের প্রকাশ ছিল সর্বজীবে, আর প্রত্যেকেই তাঁর প্রতি এই দিব্য আকর্ষণ অনুভব করত। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পাঠ করার সময় তাঁর এই মাতৃভাব সম্পর্কে আমাদের অবহিত হতে হবে।

এখন আমরা এক সংশয়ের যুগে বাস করছি। আমাদের আপন দৈবীসত্তা সম্বন্ধেও আমরা সংশয়াচ্ছন্ন। অথচ আমাদের অস্তিত্বের উৎস আমাদের দিব্যজননী ও পিতা—অনন্ত, পূর্ণব্রহ্ম। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দিব্যভাবে পরিপূর্ণ। একটি পথ, একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে, যার মাধ্যমে এই সত্যের উপলব্ধি আমাদের হতে পারে। সুতরাং এমন একজনের আবির্ভাব অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যিনি এসে আমাদের সংশয়মুক্ত করে সে-সত্য জানিয়ে দেবেন। যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষ সমগ্র বিশ্বের আধ্যাত্মিক গুরুর ভূমিকা পালন করে এসেছে। ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিক ভাবধারাই বিশ্বের সর্বত্র মহাপুরুষগণের আধ্যাত্মিক জীবনে প্রেরণা সঞ্চার করেছে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন—শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে।

সপ্তর্ষিমণ্ডলে আসীন ঋষিকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি শিশুর রূপে তাঁকে ডেকে বলেছিলেন, "আমি যাচ্ছি, তোমাকেও আসতে হবে।" ঋষি সম্মতি দান করে স্বামী বিবেকানন্দরূপে দেহ ধারণ করে মর্তে এলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ থেকে

আমরা জেনেছি, স্বামীজীকে তিনি সঙ্গে এনেছেন, কিন্তু তিনি শ্রীশ্রীমাকে এনেছেন একথা আমরা পাইনি। শ্রীশ্রীমা স্বয়ং এসেছেন কারণ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি। পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে তিনি জন্মের আগে দর্শন দিয়ে বালিকারূপে পিছন দিক থেকে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরেছিলেন, যেমনটি শিশুরা খেলাচ্ছলে করে থাকে। মাতা শ্যামাসুন্দরীরও দর্শন হয়, লাল চেলি পরিহিতা এক শিশুকন্যা বেলগাছ থেকে নেমে পিঠের দিক থেকে তাঁর গলা জড়িয়ে বলছেন, "আমি তোমার ঘরে এলাম, মা।" মা দুর্গার এক নাম 'বিল্ববাসিনী', যিনি বিল্বমূলে বাস করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ধরাধামে আবির্ভূত হবেন স্থির করেছিলেন, তিনি জানতেন তাঁর শক্তিও সঙ্গে আসবেন, কারণ শিব ও শক্তি সর্বদা একত্রে থাকেন। একবার শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "আমাকে আর একবার আসতে হবে।" একথা শুনে শ্রীশ্রীমা বলেন, "আমি আর আসছিনে।" তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "না এসে যাবে কোথায়? আমি গেলে তোমাকেও যে সঙ্গে যেতেই হবে!"

পাঁচ ভাই ও এক বোন—মোট ছয় ভাইবোনের মধ্যে শ্রীশ্রীমাই ছিলেন বড়। অতি শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে মাতৃভাবের প্রকাশ হয়েছিল। মায়ের মতোই তিনি তাঁদের বড় করেন। একবার দু-তিন বছর বয়সে সকলের সঙ্গে তিনি যাত্রা দেখতে যান। সেখানে সমবেত সকলকে দেখিয়ে এক মহিলা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, "হ্যাঁ রে সারু, এই এতজনের মধ্যে কাকে বিয়ে করতে তোর সাধ যায়?" শিশু সারদা তখন কচি দুহাত তুলে গদাধরকে দেখিয়ে দেন।

চোদ্দো বছর বয়সে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, আধ্যাত্মিক জীবনের চরম জ্ঞান লাভ করেছিলেন, সেইসঙ্গে পেয়েছিলেন যাবতীয় সাধন-নির্দেশ। শ্রীশ্রীমা বলতেন, ঠাকুর তাঁকে প্রদীপের সলতে পাকানো থেকে আরম্ভ করে সর্বোচ্চ সমাধি পর্যন্ত সবকিছু শিখিয়েছেন। আবার বলতেন, "সেকালে অনুভব করতাম, আনন্দের পূর্ণ ঘট যেন হৃদয়ে বসানো রয়েছে। এই অনুভব তখন সর্বক্ষণ হত। এই উপলব্ধির কথা অপরকে বুঝিয়ে বলার নয়।" একমাত্র পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানেই তা সম্ভব।

শ্রীশ্রীমার অষ্টাদশ বছর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেবী ষোড়শীরূপে পুজো করেছিলেন এবং সকল সাধনা তথা সিদ্ধি, এমনকী জপের মালাটি পর্যন্ত শ্রীশ্রীমায়ের চরণে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "ও আমার শক্তি।" স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে 'জ্যান্ত দুর্গা' বলতেন। গুরুভ্রাতাদের লেখা চিঠিপত্রে তিনি উল্লেখ করতেন, "বাবুরামের মার বুড়ো বয়সে বুদ্ধির হানি হয়েছে। জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গা পূজা করতে বসেছে।... জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম।"

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সকল ভক্ত-শিষ্যদের উপদেশ দানের মাধ্যমে বস্তুত ধর্ম-সংস্থাপন করলেন, এবং তাঁর ভাব প্রচারের ভার

তাদের ওপর অর্পণ করে মহাসমাধিতে প্রবেশ করলেন। শ্রীশ্রীমার বয়স তখন তেত্রিশ বছর। তাঁকে ডেকে তিনি বললেন, "দেখো, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো!" মা অনুযোগের সুরে বলেছিলেন, "আমি মেয়েমানুষ! তা কি করে হবে?" শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ দেহের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলেছিলেন, "এ আর কি করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে।" পরবর্তী কালে শ্রীমা একথার উল্লেখ করে বলতেন, "তিনি নিয়েছেন বাছা বাছা ছেলে কটি। আর আমার দিকে ঠেলে দিয়েছেন একেবারে সব যেন পিঁপড়ের সার!" অথচ সেই পিঁপড়ের সার যখন মায়ের কাছে আসত, কাউকেই তিনি না বলতেন না। আপন জননীর মতো সকলেরই সেবা করতেন, ভার নিতেন। সাংসারিক জীবকে সংসার যন্ত্রণার পারে নিয়ে যেতে এটি শ্রীশ্রীমায়ের অসীম করুণার প্রকাশ।

একবার শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে দর্শন দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নাম প্রচার করছেন কী না। বিজ্ঞানানন্দ বললেন, "না, আমি কেবল আপনার নাম (মন্ত্রদীক্ষা) দিই।" তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, "তবে তোর শিষ্যদের সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করবে কে? সে কৃপা না করলে তোর শিষ্যদের একজনও মুক্ত হবে না। তার নামও দিবি।" তারপর থেকে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ দীক্ষার্থীদের শ্রীরামকৃষ্ণ নামের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের নামও দিতে আরম্ভ করেন।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর একজন শিষ্যের কাছে পাঠ গ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। তিনি পশ্চিমবাংলার বিখ্যাত পণ্ডিতদের অন্যতম। তাঁর নাম ছিল দীনু পণ্ডিত। নয়টি বিষয়ে এম এ ডিগ্রি ছিল তাঁর। তিনি ছিলেন অসামান্য শিক্ষক। তাঁর প্রশিক্ষণে ছাত্ররা তিন মাসের মধ্যেই সংস্কৃত পড়তে, লিখতে এবং বলতে শিখে যেত। একদিন আমরা তাঁর কাছে বিজ্ঞানানন্দজীর কথা শুনতে চাইলাম। তিনি বললেন, "আমরা তাঁর সঙ্গ পেয়েছি ১৯৩৬-৩৭ সালে, তখন তাঁর জীবনের অন্তিম লগ্ন আসন্ন। ১৯৩৮ সালে তাঁর দেহত্যাগ হল। আমি যখনই প্রণাম করতুম, তিনি বলতেন, 'আনন্দময়ী, আনন্দময়ী, আনন্দময়ী।' " এই হল শ্রীশ্রীমায়ের মহিমা।

অসামান্য ছিল শ্রীশ্রীমায়ের গুরুশক্তি। এক সময়, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী বিরজানন্দ, ধ্যান করতে করতে দীর্ঘস্থায়ী মাথা যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। তিনি ধ্যানে বসে মনঃসংযোগ করতে পারতেন না। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে তিনি সন্ন্যাস পেয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমা ছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরু। তিনি মায়ের কাছে গেলে মা জিজ্ঞেস করেন, "ধ্যান কোথায় কর? হৃদয়ে না সহস্রারে?" বিরজানন্দ উত্তর দিলেন, "সহস্রারে।" শ্রীশ্রীমা বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলেন, "করেছ কি, বাবা? ও যে শেষ অবস্থার কথা—পরমহংস অবস্থার কথা। একেবারেই কি অত উঁচুতে মনকে রাখতে পারা যায়? প্রথমে একবার মনকে মস্তকে নিয়ে গিয়ে পরে হৃদয়ে নামিয়ে এনে সেখানে ইষ্টের ধ্যান করতে হয়।" শ্রীশ্রীমা তাঁর দীক্ষিত সন্তানের ধ্যানপদ্ধতি সংশোধন করে দিলেন, আর বিরজানন্দও দৈহিক সমস্যা থেকে মুক্তি পেলেন।

স্বামী বিবেকানন্দও সমস্যায় পড়লে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যেতেন। একবার তিনি অনুযোগ করে বলেন, "মা, এই তো তোমার ঠাকুর! কাশ্মীরে এক ফকিরের চেলা আমার কাছে আসত

যেত বলে সে শাপ দিলে, 'তিনদিনের ভেতর ওকে উদরাময়ে এখান ছেড়ে যেতে হবে।' আর কিনা তাই হল—আমি পালিয়ে আসতে পথ পেলুম না। তোমার ঠাকুর কিছুই করতে পারলেন না।" মা তাঁর সেবিকার মাধ্যমে উত্তর দেওয়ালেন, "বিদ্যা! বিদ্যা মানতে হয় বইকি বাবা! তাঁরা [অবতারগণ, অর্থাৎ ঠাকুর] তো আর ভাঙতে আসেন না!... তোমার শরীরে অসুখ আসা আর ঠাকুরের শরীরে আসা একই কথা।" এইভাবে শ্রীশ্রীমা নরেনের অনুযোগের সহজ নিষ্পত্তি করলেন।

শ্রীশ্রীমা স্বয়ং শব্দব্রহ্ম; ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী। অথচ সাধারণ মহিলার মতো কঠোর পরিশ্রম করতেন এবং বলতেন, "ঠাকুরের কাজ করবে, আর সাধন-ভজনও করবে; কিছু কিছু কাজ করলে মনে বাজে চিন্তা আসে না। একাকী বসে থাকলে অনেকরকম চিন্তা আসতে পারে।" ভোর তিনটে থেকে শ্রীশ্রীমায়ের দিন শুরু হত। গঙ্গাস্নান করে জপধ্যান করতেন। মায়ের বিন্দুমাত্রও অবসর ছিল না। সর্বদাই তাঁর মন ঈশ্বরচিন্তায় ডুবে থাকত। তবুও অন্যান্যদের কাছে উদাহরণস্বরূপ একটি আদর্শ প্রতিস্থাপন করতে তিনি বলতেন, এক মুহূর্তও কাজ ছেড়ে থাকতে নেই, কারণ অলস মনে যত কুচিন্তার উদয় হয়। শ্রীশ্রীমা খুব ভাল রাঁধতে পারতেন। পান সাজা, মা কালীর মালা গাঁথা সব কাজই অতি অনায়াসে সুচারুভাবে করতেন।

সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মায়ের সযত্ন দৃষ্টি ছিল—তাঁর শাশুড়ি-মা, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং আগত ভক্তশিষ্য সবার ওপর। তিনি খুব ভাল সাঁতার জানতেন, জলে তাঁর যেমন ভয় ছিল না, তেমনই সংসারে কেউ হাবুডুবু খাক—তাও মা চাইতেন না! পড়তে-লিখতে শিখেছিলেন; যখন অধিকাংশ মেয়েই লেখাপড়া জানতেন না। শ্রীশ্রীমা তাদের জন্যও একটি অনুসরণীয় আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। খুব সুন্দর গানও গাইতেন; একদিন একটু জোরে গান গাওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ শুনতে পেয়ে বলেছিলেন, "তুমি তো বেশ গাও! তা বেশি উঁচু গলায় গেও না, আপনমনে নিজেকে শোনাবার মতো গুনগুন করে গাইবে।" আর অবশ্যই জপধ্যান ও প্রার্থনায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। সব মেয়ের কর্তব্য এগুলি শিক্ষা করা, বিশেষ করে পবিত্রতা, সহানুভূতি, সুরক্ষা, আত্মশক্তি, সেবা, জপ, ধ্যান প্রভৃতির অনুশীলন। নারীদের উচিত নিজেদের দৈহিক দিক থেকে সক্ষম রাখা। শ্রীশ্রীমা পঞ্চাশ পেরিয়েও একাই আট কিলো আটা ঠেসে রুটি গড়তে পারতেন। তিনি বলতেন, ছেলেমেয়েদের ইংরেজি শেখা উচিত, কারণ ভবিষ্যতে দেশ-বিদেশ থেকে ঠাকুরের কত শিষ্য আসবে, তাদেরকে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, কামারপুকুর, জয়রামবাটী, বেলুড় মঠ প্রভৃতি স্থানের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্যের কথা, আমাদের সংস্কৃতি, দর্শন সব ব্যাখ্যা করে বলতে হবে। এটি তাঁর দূরদর্শিতার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এসব কথা মা বলেছেন ১৯১০-১১ সালে। আর এখন সেসমস্ত সত্যিই ঘটছে। স্বামীজীও নিজের মাতৃভাষা, ও সংস্কৃত ভাষা চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি শেখার উপরও জোর দিতেন, যেহেতু ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা।

শ্রীশ্রীমা নারী-স্বাধীনতায় উৎসাহ দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেমে তিনি তাঁর প্রতিটি বাক্য মেনে চলতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন স্বাধীন, কখনও কারও কাছে মাথা নোয়াননি, মেয়েদেরও তিনি সাহস, আত্মবিশ্বাস অবলম্বন করতে উৎসাহ জোগাতেন। একবার তেলোভেলোর মাঠ পার হওয়ার সময় শ্রীশ্রীমা ডাকাতের সম্মুখীন হন,

সেসময় তিনি বয়সে তরুণী। তিনি বিচলিত না হয়ে স্থিরভাবে ডাকাতের মুখোমুখি হয়ে বললেন, "বাবা, আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গেছে, আমি বোধহয় পথ ভুলেছি; তুমি আমাকে সঙ্গে করে যদি তাদের কাছে পৌঁছে দাও!" ইতোমধ্যে ডাকাতের স্ত্রীও এসেছে। শ্রীশ্রীমা তার হাত ধরে বললেন, "মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা, সঙ্গীরা ফেলে যাওয়ায় বিষম বিপদে পড়েছিলুম; ভাগ্যে বাবা ও তুমি এসে পড়লে, নইলে কি করতুম বলতে পারি নে।" এইরকম সাহস প্রত্যেকের থাকা উচিত, যা আসে পবিত্রতা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস থেকে এবং আমরা নিঃসঙ্গ নই, ঈশ্বর সর্বদা সঙ্গে রয়েছেন—এটি নিত্য স্মরণে রেখে।

একবার শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী থেকে বিষ্ণুপুর যাত্রা করেছেন। পথে একটি বন পেরোতে হয়, সেখানে ডাকাতের ভয়। পালকিতে বসে মায়ের পা ধরে গেছে, তাই মা দোকান দেখতে পেয়ে একটু তেল আনতে বললেন। সেইসময় মাকুদির জলতেষ্টা পাওয়ায় তিনিও জল খেতে চাইলেন। দোকানের সামনে ত্রিশ-বত্রিশজন মানুষের জটলা দেখে আর সকলে যখন ভয় পেলেন, মা তখন নির্বিকার—বললেন পুকুরে গিয়ে জল খেয়ে আসতে। কোনও পরিস্থিতিতেই মা সাহস হারাতেন না।

অত্যাধুনিক নগরে এবং শহরেও কোনও না কোনও কুসংস্কার থাকেই। যেমন, বিধবারা মস্তক মুণ্ডন করবেন, তাঁরা কোনও অলংকার পরবেন না, বা পাড়যুক্ত শাড়ি পরবেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর শ্রীশ্রীমা তাঁর হাতের বালা খুলে ফেলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন, "আমি কি মরেছি যে, তুমি এয়োস্ত্রীর জিনিস হাত থেকে খুলে ফেলছ?" শ্রীশ্রীমায়ের হাতের বালা আর খোলা হল না, লালপাড় শাড়ি পরাও অব্যাহত রইল। তিনি বলতেন, "ঠাকুর আমাকে রেখে গেছেন ঈশ্বরের মাতৃভাব জগৎসংসারে প্রচারের জন্য।" শ্রীশ্রীমাকে দেখে নারীদের মধ্যে অর্থহীন কুসংস্কার এবং পাপের ভয়, যার সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনের কোনও সম্পর্ক নেই—তা ত্যাগ করার সাহস বিকশিত হয়ে উঠছে।

শ্রীশ্রীমা শান্তির উৎস। একটি বালবিধবা মেয়ে তাঁর কাছে এসেছে, শোকে দিশেহারা। মা তাকে নানাভাবে শান্ত করলেন, শেষে বললেন, "কচি বয়সে বিধবা হয়েছ, তাতে কি হয়েছে? ভগবান তোমাকে আজীবন একটি পুরুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। অল্পবয়সে বিধবা হয়েছ, এ তো মহা সৌভাগ্য!" কার কখন, কী কারণে মৃত্যু হবে, কেউই বলতে পারে না। মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী তার আপন কর্মফল। অপরের কর্মের এতে কোনও ভূমিকা নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছায় মানুষের জন্ম হয়, ঠিক সেভাবে তাঁরই ইচ্ছায় মানুষের মৃত্যু হয়। বৈধব্যও বহু শুভকর্মের ফলস্বরূপ হতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইঝি লক্ষ্মীর যখন বিয়ে হয়, তিনি বলেছিলেন, "ও বিধবা হবে।" পাত্র নির্বাচন ঠিকঠাক হয়নি। লক্ষ্মী শীতলা দেবীর অংশ। দেবীর বিবাহ কোনও সাধারণ মানুষের সঙ্গে হতে পারে না। তাঁর বৈধব্য কোনও পাপের ফলে নয়, বরঞ্চ স্বামীর তুলনায় তাঁর মহত্তর সত্তার কারণে হয়েছিল।

মেয়েদের শ্রীশ্রীমা উপদেশ দিতেন, "মেয়েদের আসল অলংকার পবিত্রতা ও দিব্য ভাব। অতএব আপন পবিত্রতা রক্ষা করে চলবে। পরিবার, স্বামী, সন্তানের আস্থাভাজন হয়ে থাকতে হয়। পবিত্রতার চেয়ে মূল্যবান অলংকার আর হয় না। নিজের

মধ্যে মাতৃত্বের প্রকাশ ঘটাও। এটাই তোমার একমাত্র কাজ। সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করো।" শ্রীশ্রীমায়ের মতো সরল অথচ মহিমময়ী আর কাউকে আমরা দেখি না। সুস্বাস্থ্য, আধ্যাত্মিক চিন্তা ও পবিত্র চরিত্র—এই হল সৌন্দর্যের সংজ্ঞা। যখন মনে বিরাজ করে মহৎ চিন্তারাশি এবং সেইসঙ্গে প্রত্যেকের প্রতি হৃদয় থেকে উৎসারিত হয় মাতৃস্নেহ, এর থেকে বেশি সৌন্দর্য আর কী হতে পারে?

ভোগবাদী সমাজে শ্রীশ্রীমায়ের ধারণা সর্বদা প্রাসঙ্গিক, যেহেতু তিনি সমস্যার মূল দেখেন। তিনি শিখিয়েছেন, যা আছে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়, জিনিসপত্র ব্যবহার করার সময় সাশ্রয়ের দিকটা দেখতে হয়। আনাজপাতি কিনে এনে ঝুড়িটা ফেলে দিতে নেই। কার্পণ্যও নয়, আবার বেহিসাবি খরচও নয়, এই দুইয়ের মাঝামাঝি অর্থাৎ মধ্যম পন্থা অবলম্বন। যখন প্রয়োজন, কেবল তখনই খরচ করতে হবে। শ্রীশ্রীমা বলতেন, "যার যেটি প্রাপ্য সেটি তাকে দিতে হয়। যা মানুষে খায়, তা গরুকে দিতে নেই; যা গরুতে খায়, তা কুকুরকে দিতে নেই; গরু ও কুকুরে না খেলে পুকুরে ফেললে মাছ খায়—তবু নষ্ট করতে নেই।" মা খুবই সাশ্রয়ী ছিলেন, কোনওকিছু অপচয় করতেন না। একজন ঘর ঝাঁট দিয়ে ঝাঁটাটি ছুঁড়ে ফেললে মা বলেছিলেন, "ও কি গো, কাজটি হয়ে গেল, আর অমনি ওটি অশ্রদ্ধা করে ছুঁড়ে দিলে? ছুঁড়ে রাখতেও যতক্ষণ, আস্তে ধীর হয়ে রাখতেও ততক্ষণ। ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ, সেই রাখে। আবার তো ওটি দরকার হবে? তাছাড়া, এ সংসারে ওটিও তো একটা অঙ্গ। সেদিক দিয়েও তো ওর একটা সম্মান আছে। যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।"

শ্রীশ্রীমায়ের বেশ কৌতুকবোধ ছিল। আমাদের জীবনেও এর প্রয়োগ শিখতে হবে। সাংসারিক ঝড়ঝাপটার দিনেও আমাদের হাসিখুশি থাকা দরকার। নিজেকে নিয়ে হাসতে শেখা উচিত। একবার নিবেদিতা গভীর শ্রদ্ধা সহ শ্রীশ্রীমাকে বললেন, "মাতাদেবী, আপনি হন আমাদের কালী।" ক্রিস্টিনও ইংরেজিতে একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। কথাগুলি শুনে মা হাসতে হাসতে বললেন, "না, বাপু, আমি কালীটালী হতে পারব না। জিব বার করে থাকতে হবে তাহলে।"[১০] লীলাবসানের কিছুকাল আগে, খুব অসুস্থ অবস্থায় শ্রীশ্রীমাকে পথ্য হিসাবে কেবল বার্লি খেয়ে থাকতে হচ্ছিল। আগে তিনি সামান্য ফলমিষ্টি যা কিছু খেতেন, তার অবশিষ্টাংশ প্রসাদরূপে ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হত। যখন কেবল বার্লি-জল খেয়ে থাকতেন, তখন মা বলতেন, "কি গো, আজ যে প্রসাদে ভক্তি নেই?"

এমন একটি সর্বাঙ্গসুন্দর কল্যাণময় জীবন অনুধ্যান করলে আমাদের সর্বতোমুখী কল্যাণ হবে। আমাদের বিনম্র প্রার্থনা, "মা, আমাদের মানুষ করো।"✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীমা সারদা দেবী*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১২

প্রবন্ধটি 'Vedanta Kesari' পত্রিকার জানুয়ারি ২০০২ সংখ্যায় প্রকাশিত 'The Holy Mother' প্রবন্ধের **সুমনা সাহা** কৃত অনুবাদ।